সাধনা

নক্ষত্রে পৌঁছে দিও ঘুমমাখা প্রার্থনা
এখানে আমি ছিলাম না
কোনো কালেই না
খোলাচোখে দিঘি দেখার দায়ে
চোখের রগ কাটা গেছে
এ কথা বলার কি আছে!
তুমিও বলো না কিছু
কোনোখানেই যথার্থ দুঃখ নেই
পরতে পরতে ঘুণের ঐতিহ্য

বেলা পড়ে গেলেও
ঘরে ফিরে না কেউ কেউ
ফিরলে দেখতে পেতো ইচ্ছামৃত্যুর
পালকে পালকে ছেয়ে গেছে ঘর।

ফালগুনে

হাওয়ার পথে পথে, মাঠের দিগন্তে উড়ছো অবিরত
তোমার উড়ন্ত মোহনা ধরে পৌঁছে গেলে পাখিপুরে
ঝরাপাতা ডাকে— হে নাগরিক, ধীর হাঁটো আরও ধীর
অধির বিকেলগুলো স্বপ্নান্ধ লোকের মতো
মন থেকে মাঠে পাঠায় প্রতীতি
মৌনতাবশে কিছু হাওয়া শুধু গায়ে মাখি
মাঠছুট এসব হাওয়ায় ধরা আছে তার ছায়াচূর্ণ
যাকে হারিয়ে এসেছি মান্দারের গাঢ় লালথোকে
ফাল্গুনের অধর থেকে উত্থিত চুম্বনের ঢোক
মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে হয়ে ওঠে মানুষের নির্জন থোড়
সম্পর্কের পাতায় পাতায় জ্বেলে ত্রিকালের ধ্বনি
আগুনমাখা স্মৃতি ঘুরে ফাল্গুনের প্রহরে
একজন থাকে পাতায় পাতায়, একজন ডালে

পথহাঁটা

শাদাপোকাটি শহরের গলি থেকে গলিতে
সংবেদন নিয়ে ঘুরে গুজবের মতো
ক্রম দীর্ণ পোকার
সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যায় নৈর্ব্যক্তিক টিউমার
এই শহরে সে এক পাদুকা হারিয়ে ফ্যালে
যাদুর এই পাদুকা বলে দিতে পারে মানুষের ভবিষ্যৎ
পোকাটির সারল্য দেখে যাদের মনে কেবল
ঈর্ষা জাগে, হৃদয়ে জাগে অমিত রহস্য
তারাই তাড়িত হয়ে সন্ধান করে অমর পাদুকা।
বিজন গন্ধের ভিতরে সময় টেনে চলে গলিত মাতৃত্ব
মোহময় পাদুকাটি শাদাপোকার আরাধ্য ওঙ্কার
ঊষা থেকে ঊষাতে ছড়িয়ে
জনপদে স্বপনজারি করে ঊর্মীমুখর ভ্রমণের।

শাদাপোকাটি মানুষের
মাথা থেকে মাথায় নক্ষত্র স্থাপন ক'রে
জীবিত আর মৃতগণের মধ্যে যুক্ত করে
বিচ্ছেদের নৈতিকতা
কেউ কেউ শাদাপোকার পেছনে ছুটে
একটি প্রকৃত ব্যাখ্যাই বোধ করে—
পোকাটি আসলে যার যার একক গুঞ্জন
আর সেই পাদুকাটিই হারিয়ে গেছে
যার সম্ভ্রম বাঁচাতে মানুষ এতদূর হেঁটে এসেছে

পরম্পরা

কেউ আমাকে বলেনি বাবার মতো গাইতে হবে
জলমগ্ন পুকুর থেকে হঠাৎ বাতাসের ঘোর এসে
বাবার ইতিহাসচেতনা শুনিয়ে গেছে
আর আমি দৈবটিকেটে ঘুরে আসি নীলকণ্ঠী সহস্রাব্দ

কোথাও একশ-পাঁচশ বছরেও ঘুম কাটেনি
কোথাও চোখজোড়া আত্মিক রুগ্নতা নিয়ে
দেখছে লিপিপাথর, প্রত্মদরজা ও উত্তর-দক্ষিণ।
দরজায় দাঁড়িয়ে যিনি টোকা দিচ্ছেন, তার হাত
থেকে আঙুল খসে পড়ছে; হয়তো তিনি
আমাদের জন্য কোনো বীজভাণ্ডার রেখে যেতে চান

এই পুকুরের বিভুতি কারা এসে নিয়ে যায়
সঙ্গীতজ্ঞ বাবাকে কোনোদিন প্রশ্ন করিনি
সংঘের তালুচাপা ওম থেকে বেরিয়ে এসে
একজন যুদ্ধাহত তার চোখদুটি বাঁচাতে চাইছেন
ঘন অন্ধকার স্থিরবিন্দু ক'রে চক্ষুদ্বয়
প্রচণ্ড ঘুমপ্রবণ হয়ে ওঠে
বাবা হয়ে ওঠেন হাওয়ার গ্রন্থনা
আমারও আর গলা ছেড়ে গান গাওয়া হয় না

হন্তারক

রক্ত ঝরে পড়ছে না ডানচক্ষু থেকে
রক্ত ঝরে পড়ছে না বামচক্ষু থেকে
রক্ত ঝরে পড়লে
একটা দর্শন হতে পারতো রক্তাক্ত

এখানে অর্ধেক মিথ্যা আছে
এখানে অর্ধেক মিথ্যা ক্ষিপ্ত
আমরা সবসময় মিথ্যা বলতে পারি না
সবসময় মিথ্যা বলতে পারলে
একটা মিথ্যা বাস্তব পাওয়া যেতো

মানুষের ছায়া মানুষকে সঙ্গ দেয়
মানুষের ছায়া ব্যক্তিগত স্বপ্নবাহক
মানুষ স্বপ্নের ছায়াও ধরতে পারে না
আলোর প্রলাপে ছায়া হয় দূর
তুমি ভাবো ইতিবাচক
আলো কেবল ছায়ার হন্তারক

তন্দ্রা

কাঁধের উপর যমের পবিত্র দেহ
কোনো প্রকার নালিশ ছাড়াই দুলছে চৌকস ঘড়ি
তার শাসন এসে লাগছে জীবের মুণ্ডুজুড়ে
আমরা কি পার পেতে পারি সামাজিক দশা থেকে!
অনেক বন্যতা শেষে এখানে রক্ত ছুঁয়েছে দূষণ;
হারামির স্রোতে
প্রিয় ঠোঁটের নিচে নেমে এসেছে ঈশ্বরের টিউমার
আর এইতো ব্যক্তিগত পবিত্রতা
যা জন্মসূত্রে পিছু নিয়ে ঘুরছে অনন্ত উন্নয়ন

তন্দ্রা ভেঙে ছুঁয়েছিলাম যেসকল মুখের মোহর
সমূলে মিলিয়ে গেছে গলির কুয়াশায়
নির্জনের সমন এসে হাওয়া দিয়ে গেছে তন্দ্রাকে
তন্দ্রা কেটে গেলে
দেখবার মতো মুখ নাই, সব মুখ বুজেথাকা
ডাকের বাক্স
সে ডাকও আসে নির্লিপ্ত পাথর থেকে!

একদিনের বাবা

হয়তো তুমি পূব-পশ্চিমের আসমানে মেঘ হয়ে গেছো
আর চুম্বন করে গেছো আমার অনবরত ব্যর্থমুখ
তোমার ঠোঁটজোড়া অপার্থিব কুয়াশায় ভেজা ছিলো
আমি ছিলাম দৈবপ্রেরণাহীন নরোম অন্ধকার
আমার গাত্র ডুবেছিলো অনর্থক তরলে
অঙ্গবর্গে খোদিত ছিলো দুরারাধ্য কালো কালো প্রদীপ
তোমার নবজাতকীয় শুভ্র স্বরলিপি ছুঁয়ে বৃষ্টি হলো
আমার উঠানজুড়ে; ধুয়ে নিলো স্পর্শাতীত স্বপ্নযাত্রা
আমার অতর্কিত চিৎকারে ঈশ্বর তার আসমান সংরক্ষিত রাখলেন
জমিনে পড়লো মরা ঈশ্বরের শেষ প্রজ্ঞাপন

চক্ষু বলে

আমার চক্ষু খুলে খেলে তোমার অসুখ ভালো হয়
এভাবে অন্ধকারচর্চা শুরু
অন্ধ হওয়ার আগে
গুপ্তহত্যা, নবারুণ আর শাস্তিবিধান। লক্ষ্মীটি আছো;
সাতহাজার টানা চোখ তোমার, আছে তারাও
তবুও এই মধ্যবেলা দৃষ্টি দিয়েছো ঘুরিয়ে
যেখানে বাজে আমার শত্রুর বাঁশি
তীব্রতাণ্ডবে
তোমার সাতহাজার চোখ, একটিও অন্ধ না
সবকটির বেহেশত দাবি করে আমি বসে আছি
বালুভরা ব্যাগের উপরে
প্রকৃত বেদনার উৎস থাকে না

শশীকে বলে যাই

শশীকে বলে যাই, দেহরাষ্ট্রে কোনো সুবচন নাই
দেহের ভিতরে দেহকোষ তার ভিতর
ঘুণের খননপ্রতিভা
বোবাযুদ্ধে নিরন্তর মৃত্যুখননই
বন্ধুরপথে নমুনা দেখায়
কালখোর স্মৃতির সঙ্গে একলা মানুষের ক্ষরণযাত্রা
চতুর থেকে চতুর ধরে আর ছাড়ে
বিপণ্ন বাতিঘরে
খুঁজে পাওয়া মর্সিয়া ভাবের সঙ্গে মিশে
তারে নিয়ে সম্পর্কের লালার ভিতর মধুজাগরণ
কী এমন দিতে পারে বন্ধুবদল!

সত্তার অধিগ্রহণ চলে ঈশ্বরের অঞ্চলে
যেখানে প্রাচীন দৈব গুঞ্জনের ভিতর মানুষ
মানুষ হতে হতে একা হয়ে এসেছে
সেই বীজপত্রে সারাদিন তুমি গড়িয়ে গড়িয়ে গতরে
মাখো জল্লাদের ভ্রম
মলিন বকুলখানি হাতবাড়িয়ে নিয়ে রেখে দাও
নিষ্পলক চোখের পাশে
তখন শুরু হয় নিঃসঙ্গ প্রতিভার দুর্লভ বিকার
তাই দেখে হাসে দস্তার মানুষ!

শোকবই

নদের ভিতরে নদ দেখে
রক্তঘন নয়ন মুছে নিলাম
ইতিহাসের অন্ধ পুরুষ
এ বিজয় মানতে পারলো না
ত্বকের ভিতরে ঠুকে দিলো
পুনঃ পুনঃ পুত্রবিয়োগ।
আগুনধরা শিরায় বাহিত
আগ্রহের সাধন অঞ্চল
ঠাণ্ডা অন্ধকারের নিমজ্জন
ঈশ্বরের সড়কে উড্ডীন
তার পরিসর ঘুরে আসে
এক প্রকার দ্বৈত বিলোড়ন
ডুবতে ডুবতে ভাসি
ভাসতে ভাসতে ডুবি
তৎপরতায় জড়িয়ে যায়
আমার ঘুমের বাহন
জেগে উঠে দেখি-
কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হলে
প্রকৃত দৃষ্টি খুলে যায়

নদী

নদী, তার সতত পুলক থেকে ক্রমেই ফুরিয়েছে নুড়ি
শিরার ভিতর চেপে রাখা বালুর মহাল
জলজ ক্রন্দন তুলে
মানুষ, তার জলযাত্রায় গলায় আটকে থাকা মহৎপাথর!
রূপালী যুবতীকে ঘুমের মুক্তা দিয়ে
ডুবুচরের বেদনা নিয়ে পাশফেরে জলসমাজ
তার চোয়ালের কাছে গোপন সঙ্গীত আসে;
শিরার ভিতর কলহের সূচনা দিয়ে
ডুব দেয় সেই নদীতেই!
পৃথিবীর সকল পিতৃজল একপাশে রেখে
গভীর মৌনতা দ্বারা মানুষ তার ক্রন্দনের রেণু
লুকাতে পারবে না ঈশ্বরের মহাফেজখানায়
সৃষ্টিসেরা— এই রক্ষণশীল বাক্য দিয়ে আর কোনো
চমকের জন্যে অবশিষ্ট ভুবন নেই
কিন্তু নদীতীরে ভোগ দিয়ে কিছু লোক হয়তো
ইতিহাস করতে চাইবে
তবুও শোধরানো যাবে না চক্ষুজল কিংবা খুনের পাহাড়

দরদীপাথর

মাটির পুতুল হলে কথা বলতো
মানুষ হয়েও এড়িয়ে গেছো!
আরাধনার তূরীয় জল ফেলে
ঘাড় ঘুরিয়ে আমিও যাচ্ছি
পিতলের মৌনটিলায়
যে গতিতে কর্ষণ যায় শস্যের তিমিরে
অগ্নিচোষা মানুষ যায় পুড়তে পুড়তে।
বুকে থাকা পাঁজরের বোবাবিশ্বাস
হৃদয়ে চিন্তা ঠুকে বিব্রত করেছো তার
স্মৃতির আকর
এমন কোনো দরদীপাথর নাই
বসে একটু জিরানো যায়!
মানুষের কাছে এক অনন্ত খাদ আছে
যার সামান্য দেখে তুমি হয়ে গেছো পাথর!

অধিক জ্ঞানে কুসুম হারানো ডিম্ব এখন
তাপ নিচ্ছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে

সুচিনপাখি

মলিন দিনের ঘোরশূন্য দেহে
পড়ে আছে আকুতি
স্মৃতিঠোকড়া সুচিনপাখি
চিনতে পারে রক্ত, ত্বক, সুরৎমূল
তারপর আগ্রহ ভরে বেঁচে
থাকে কেউ সবটাই হারিয়ে
দুর্লভ বিষচাপা দেহ, শোণিত
সব খেয়ে উড়ে যায় সে
মানবদেহে জমে উঠে
মায়ামণ্ডিত নিমজ্জন!

দুহাতে মৃত্যুকল্পনাঘড়ি
নির্জন কামরায় ডাকাতের ছুরি
বাতাস কাটে আর এগোয়
প্রাণের উপর বসে থাকে
এক নির্লিপ্ত গোধুলি
আগামী সূর্যদিবসে
বরং পাঠ্যসূচিতে আসুক
নিরক্ষর চাঁদ
অবিরত মানুষ চিত্তখুনে নিমগ্ন
ডানা মেলার আগে মৃত্যুর
নিশ্চয়তা শোনাক সুচিনপাখি

লুচেন সাংমা

দুটি পাথরের চোখ অথবা চোখের পাথর
পাহাড়ি আলো মেখে ছুটছে
আরো একবার কন্যাসন্তান চেয়ে প্রার্থনা
ঈশ্বরও বিমুখ করলেন না
দাহাপাড়া থেকে বিরিশিরি রোজ দৌড়পথ
নিয়তির গ্রাম থেকে মফঃস্বলের গুঞ্জন
হৃদয়ে তাপ ছড়িয়ে যায় টাকা
তবুও মানুষটা হারায় না, হারেও না
আরো শক্ত করে ধরে মূলের মুঠি
দাদা, আপনারা পাহাড়ে কী দেখবেন?
একটাই দেখার আছে— পঁচিশে ডিসেম্বর
আমরা সারাপাড়ার লোক এক কলাপাতায় খাই
আসবেন, দেখতে পাবেন, ভালো লাগবে।
ফিরতে ফিরতে ভাবি—
লুচেন সাংমার অহংকার দিয়ে
সংবিধানের চার মূলনীতি সংস্কার করা যায়!

তত্ত্ব

ঘুড়ি উড়িয়েছে যে ছেলেটি
মহাশূন্যের দিকে যার চোখ বাড়ানো
তার সঙ্গে ঈশ্বরের ভাবগল্পে
ধরা পড়েছিলো যাদুময়তার ঘোর!
ছেলেটি তার নাটাই হারিয়ে এসেছে বহুদূর
হারিয়ে এসেছে ঈশ্বরও

এক অবিনাশী সংশয়ের কালে
হৃদয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তৈরি হলো
পরস্পর স্থিরকৃত রোদনভাষ্য।

তবুও দুটি আশ্চর্য চোখ তার খোলা রয়েছে
ঘুম, কাম, জ্ঞানতত্ত্ব টপকে গিয়ে
মরামাছের ভিতর ঘোর হয়েও দেখেছে
ঈশ্বররূপী নিঃসঙ্গতা ছাড়া
নতুন কোনো যাদুময়তা লিপ্ত নাই
ছেলেটি তার নিঃসঙ্গতা হারাতে চায় না বলেই
পাথরে পাথরে ঈশ্বর খোঁজে

বর্ষার গান

বর্ষা যদি আসে
জানতে দিওনা আমাকে
বিদায় দিয়েছি যাকে
চোখের কোণে নীল বিন্দু দেখে
জলজ দিনের ভাষা
লুকিয়ে এসেছি মাছের শরীরে
জগন্নাথকান্দি থেকে
হেমা কৈবর্ত ডাকে
জিজ্ঞেস করেছি তাকে
বুর্জোয়া পাথরের বুকে
কোন্ শিরোনাম যাচেছা রেখে!
সকল বর্ষাবার্ষিকীতে
সম্পর্কে অর্জিত জের
ঘূণাক্ষরে রচিত থাকে
যৌবনের নিরুদ্বেগ হাঁড়ে।
প্রমূর্ত মেঘের ফাঁকে
মূলত মা থাকে

বৃক্ষের কাছে

সুহৃদ বৃক্ষ, আমাকে অধিগ্রহণ করুন
পুরনো আস্থা ভেঙে আসা আমি একবিন্দু আয়ু
ঘুমজাগরণের মধ্যস্থতায় হারিয়ে এসেছি স্মৃতি
পূর্বকোণ বাতাসে উড়ে গেছে চোখের গোধুলি
মানুষ থেকে মানুষে পৌঁছতে ক্রন্দন লাগে
আর লাগে নিঃসঙ্গ অধিরতা
এই অসমভূমে শিকারির প্রবল থাবার পরেও
যে পশুটি হারাবে না তার আয়ুর গহন
যে বোনটির কিছুই করার থাকবে না ভাইটির জন্য
তাদের উদ্দেশ্যে এই রীতি জাগ্রত থাক
যা আমি কোন সম্পর্কের ভিতর খুঁজে পাইনি।

সুহৃদ বৃক্ষ, আমি আপনার স্নেহশীল ছায়া দাবি করছি না
পাথরে পাথরে হারিয়ে যাওয়া আমার
আন্তরিক ভুলগুলোও ভাঙতে চাই না
গোলাম বিবির একই আয়ুষ্কাল নিয়েও কোনো অভিযোগ নাই
ভ্রূণ জাগছে, ভ্রূণ ডুবছে এই অবিরলেও আমি
পাতাটি থেকে পাতাটির দূরত্বের মতো নির্লিপ্ত
তবুও তাদের কথা ভেবে কেনো কান্না পায়
যারা উচ্চারণের সঙ্গে গিলে ফেলেছে কান্নাও!

নদী সোমেশ্বরী

অস্ট্রিক স্রোতের ঘোরে ভেসে গেছে মনেশ্বরী
স্মৃতির বালু গড়িয়ে বইছে নদী সোমেশ্বরী
মৌলিক দ্বিধায় পুড়ে দুটি হৃদয় রাঙতার ভাসান
তুমিও নেই আমিও নেই টলটলে জলের আখ্যান
দুইকুল জড়িয়ে আছে গারোপাহাড়ের গান
রাত্তিরে পড়ে শোনান অনিন্দ্য জসিম
নদী মাতা যার বোধের অন্তহীন ঘূর্ণি
খুলে যায় মানুষের ভিতরে আর এক মানুষ
যে পাহাড়ে থাকে অথবা নদীর কাছাকাছি।
বন্ধকী মাথার খুলির নিচে দ্বিধা রেখে
এসেছি নদীর কাছে নিমজ্জন চাইতে

কিছুতেই কাটে না উপনিবেশিক জ্বরঘুম

প্রেমের কবিতা

পাতা ঝরে পড়লেই ছোটকাকুর কথা মনে হবে; মাথায় ভন ভন করে পাতামুখর হাওয়ার স্কুল। ছোটকাকু পাতার বাঁশি বাজাতেন অবাঙ বিকেলে ঘুরে ঘুরে; অল্পের জন্য রিনাখালাকে মিস করেন এই বসন্তময় দ্যুতির পুরুষ।
এরই মধ্যে অনেক ঋতুর আসা-যাওয়া আর কয়েক বছরের ঠ্যাক। ছোটকাকু তখন গাছতলার জটওয়ালাসাধু— কাঁচা ঢেঁড়শ চিবান দুইগাল ফুলিয়ে। পেছনে তার আরো এক ভূগোল; মানুষের ব্যক্তিগত স্তনন। ঘরের বাইরে তার ঘর; পুষ্করিণীপাড় জইয়া গাছের তল।
যেকোনো উত্তরণের মন্ত্রদায়ক, ত্রাতার সায়র জটওয়ালাসাধু— তখন গ্রামের সকল ঋতুমতি নারীর পারহওয়া সেতু!
মাথায় ত্রিকালবিস্তারী ঘোমটা টেনে রিনাখালাও এসেছিলেন সেদিন বাঁজার উপশম নিতে

এভাবে কি আর হয় রিনাখালা!

লিপি বিশ্বাস

স্মৃতির একটু দূরে বসে লিপি বিশ্বাস গান ধরে
যে তারে করেছে কাঁটায় কাঁটায় ঋদ্ধ
বাজিয়েছে হৃদয়ের শত জানালা
তার জন্য, শুধু তার জন্য লিপি বিশ্বাস
ঘুমের ভিতরে হাঁটে। সোনালী ধানের শীষ দোলে;
পৃথিবীও দোলে শূন্যতাজুড়ে
রক্তে মৌনতা মিশে তৈরি করে প্রস্তরভরা পথ
এ পথ হেঁটে এতদূর এসে লিপি বিশ্বাস
সবটুকু ঘুম হারিয়ে ফ্যালে গাজীর দরগায়
কামেল সত্তা পথ এগোয় মানুষের শেষ উজ্জ্বলতায়।

এই পুকুরের জলে আত্মা খুলে ধুয়েছিলেন গাজীবাবা
জিকিরে জিকিরে চলে সেই আত্মাশুদ্ধি পূর্ণিমার খোঁজ!
হিজল গাছের পিছন থেকে এতোবড়ো
পূর্ণিমা উঠে আর ডোবে উল্টাদিকে
যাদের আমলনামা লেখা হয় দরগায় আগরবাতি মোমশিখায়
ভাগ্যাহত সুহৃদ, কিংবা পরম প্রতিভাধর
রাতভোর জিকিরের পর ছায়া-কায়া একাকার করে
আর লিপি বিশ্বাস গলা থেকে সুরের গোধুলি ছোড়ে
আগুনে আগুনে আঙরা দেহ বিস্মৃতিজুড়ে খুঁজে চলে তারে!

নির্জর্ন দুপুর

খোলামাথায় হাওয়া ভরে সেদিন নির্জন দুপুরে
তোমাকে দেখেছি চড়ুইপাখির উড়নদৃশ্যই দেখছো
দুপুরে তোমার একলা দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের
শহরে নতুন কোনো ব্যঞ্জনা নয়
তবুও তুমি আছো প্রকৃত দৃশ্যবেদনার মতো
আলোকিত আর রহস্যময়
কিছুই করার না থাকলে আমাদের ঘুম পায়
আর ঘুমের ভিতর পায় স্বপ্ন
দুপুরজুড়ে
এও এক প্রকার অসুখ, কিন্তু ঐশ্বরিক!
ভেসে নির্জন তন্দ্রার স্রোতে
অজগরের মতো পৃথিবীর পিঠ থেকে গড়িয়ে
সকল ফলবান বৃক্ষ পাশ কাটিয়ে
আমাদের যে ছোটবোন, যার আয়ু ছিলো তিনমাস
সাতদিন, তার খণ্ডায়ু পার হয়ে অস্ফূট ঘোরের ভিতর
এই নির্জন দুপুর
নির্লিপ্ত নয়নের পাশে টলটলে জলের অক্ষর!

আমাদের

বাতাসের ছুরি কাটে ঘুমন্ত জল
শিল্পভুক এক কবি চোখ মোছে দাঁড়িয়ে

দিনে দিনে হারানো মানুষ
টানে ফোঁটা ফোঁটা মৃত্যুর সূচি

ভুল করে আমরা জন্মের ক্রমবিকাশ চাই
ভুল করে নিজের গহনে ফুটাই অসীম মাংস
ভুল করে ভাবি, বড়ো আর মহৎ হওয়া যায়
শুধু মৃত্যু আমাদের ঠেলে দেয় সর্বত্র উত্তরণের দিকে

দণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে নিরালাপুর যাত্রী
অন্ধকারে উত্তোলন করে বিধাতার রেশন

আমাদের মুখের অমল ঝরে পড়ে রোদে
আমাদের কালো বোনটিরও লাবণ্য আসে
আমাদের একজোড়া পিতলের চোখে
প্রভুর কৃপায় অন্ধমোচন ঘটে গ্যাছে!

মহাদেশ

চুম্বনে চুম্বনে নীল হয়েছে ঘাড়
রক্তের কুয়াশা গলে ভেসে ওঠা বিস্তীর্ণ ঘুম— মা, অনুজ্জ্বল নক্ষত্রটি
সকল তাড়নার গলাটিপে
যন্ত্রের ভিড়ে তোমার নীল ঘাড়— গরুর ওলানের মতো সুপেয়!
এই ধারাবাহিকী মূলত আমার অহংকার
দর্পণে দেখি বারবার হারিয়ে রক্তপাতের মোহ
যা মন্থন করে ব্যক্তিক যাত্রাপথ, তার সূচনা থেকে বহু দূর!
জগতের ভার পড়েছে আমারই ওপর
তাকে সারিয়ে তুলতে হবে হাঁড়ের ক্ষয়বোধ থেকে!
তুমি জানো নাকি মা,
আমার সূত্রসমুদয় ধানচারায় দুলেওঠা হাওয়ার প্রেরণায়
জমে উঠেছে মাঠের বীজপত্রে
মুরগিছানার মতো নির্লিপ্ত রয়েছি তোমার পাখনাতলে
বহুকাল আমি ঘুমিয়ে থাকতে পারি
নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন।
জলের তোড়ে দেহ ভেসে গেলে, আমি হয়ে গেলে
বিকেলের পড়েথাকা রোদ; সবখানে সমান সৌরভে
মা, মাতৃকা চুম্বন করে
হবো এক মহাদেশ তোমার অশ্রুপাতে

ছায়াসঙ্গী

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বলতে
আমি জীবনানন্দ দাশকে বুঝি
শাসন বলতে ‘আটবছর আগের একদিন।’
তর্কক্লান্ত এক সভ্যতায়
এই প্রকল্প প্রস্তাব করে মঞ্চত্যাগের কালে
প্রেসের লোকেরা জেঁকে ধরে
তারা আমার কাছে গভীর ব্যাখ্যা দাবি করে
উপস্থিত সভ্যরা হাততালি দিয়ে সমর্থন করলে
বিচলিত হয়ে পড়ি এই ভেবে—
একটা সরকারি তদন্তের ভিতর দিয়ে
বাংলাদেশের সবগুলো লাশঘর
আমাকে ফেস করতে হবে কিনা !

তবুও ছায়াসঙ্গী মানুষ বলে
অন্ধকার আমিও ছড়াতে পারি
এই ভাবনা থেকে প্রস্তুতি নিতে থাকি
এরই মধ্যে মাইক্রোফোনটা আমাকে ঘিরে ফেলেছে
পকেট থেকে দুটি সুঁই বের করে
একটি নিজের চোখের উপর
আরেকটি মাইক্রোফোনে চেপে ধরলে
অন্ধকারের শব্দই তখন সার্কুলেট হচ্ছে
সেখানে সবচেয়ে কার্যকর শাসন—
‘আটবছর আগের একদিন’

মুক্তিযুদ্ধ

জগন্নাথকান্দি গ্রামের উপর তখন আসমান নাই! দক্ষিণের চকে উন্মুক্ত আলোড়নে যা ঘটেছে সাক্ষী থাকেনি কোনো চান-তারা-গ্রহকুল! পশ্চিমে গোপীরমার লাউমাচায় শাদা শাদা ফুল, উত্তরে জগন্নাথকান্দি মাথাভাঙ্গা গ্রাম। পূবের গোরস্থান ধরে রাত্তিরে ছায়েদ আলী হাঁটে, নিজের ছায়া বিমুক্ত করে জিকির তোলে আর সোলেমান শাহ'র সঙ্গে লাইন লাগায়!

দক্ষিণে দ্যুতিময় হাওয়ার সড়ক— মড়মড় করে মাটি ফাটে মিষ্টি আলুর ক্ষেতে, অবিশ্বাস আঁকড়ে ধরেছিলো তোরাব আলীর বোবা মা— গতরের উপর পাষণ্ড ভর-মাটি-মাংস-শরীর-শৌর্য, অনাহুত শীৎকার—মানুষের সঙ্গে মানুষের ডর নাই! নারীদেহ ভেসে গিয়ে আজব আন্ধারে, আত্মা অবধি গড়িয়ে যায় এক নতুন সত্তা!

সেই অবাঙ রাতের আয়ুষ্কাল বর্ণনা করে বাঁদুড়গুলো আর ফিরে আসেনি! তারপর এককুড়ি তেরো বছর ধরে রাত্তিরে দক্ষিণচকে, বাবা আবিষ্কারে যায় তোরাব আলী

মনতন্ত্র

মানুষের দুরূহ বিষাঙ্কের সামান্য দেখে তুমি হয়েছো পাথর
জটিল মনতন্ত্রে অধির চেতনা শুধু সুখের জন্য পাথর কাটে
বালকবেলার বিরল প্রত্যুষগুলো দূরাশার পালকাঁপানো ঘোরে
নির্জন বলয় নিয়ে খেলা ক'রে আজও ঘুমেই পক্ষি ধরে।
দিন কাটে, আবার কাটে না; বর্ধিত একাকীত্বের চঞ্চল মুখ
সকল মানবিক সম্পর্কের ভিতর বুদ্ধিবাদের গরম চুম্বন ছড়ায়
ভালোবাসা কিংবা দাসপ্রথা, যেকোনো একটি হলেই মতান্ধ
ঘুমকে সঙ্গী করে স্বপ্নের চোরাপথ পার হই আর জাগিয়ে দেই বমিবমি।
তারপর সহায়ক ছুরিতে কাটি অভিপ্রায়গুলো— সম্পর্কের বর্ণিল পতনে
চঞ্চল হতে থাকে যার যার টিউমার;
তার কাছে পৌঁছানোর আগে আরও একটি কামড় অথবা ইচ্ছামৃত্যু!

তুমি কি একবার পরখ করে দেখবে!

তারাবাতির অতিথি আলোর রূপসী স্টেশনে

একদিন নন্দনকামনাসহ খাদে পড়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীসাথীরা দেখতে পেয়েছিলো। অনেকেরই হাতে ছিলো অবমুক্ত করার মতো পাখি। তার দুয়েকটি ছুঁড়েওছিলো ঘোরের নিশানায়। কার সোনালী আদেশে পশ্চিমমুখী পাখিগুলি মিলিয়ে গেলো, বোঝা গেলো না। খাদের চারপাশে মেঘধারী হাওয়ার ঘুরঘুর; মানবের ধূসর অনিশ্চিতি গড়িয়ে গেলো ঈশ্বরের বিদিত অঞ্চল দিয়ে। পাখিওয়ালার ঠাণ্ডাচোখ গলে পথ ভেসে গেলেও পৃথিবীর কোনো অংশে জড়তা জাগেনি।

সঙ্গীসাথীরা আকীর্ণ হলো তারাবাতির অতিথি আলোর রূপসী স্টেশনে। অমীমাংসিত লিপ্সার ভিতর নিয়ন্ত্রণের বালু দিয়ে ঈশ্বর যেমন ঘোর সংশয় চেয়েছিলেন- আমরা যার যার লাল মোরগ জবাই দিয়ে তার স্খলন চাইতে পারিনি। লোহার অঙ্কুরোদ্গম সহজ হয়েছিলো, তার চেয়ে কঠিন আমরা চেয়েছিলাম বলে। পরস্পর নিরোধের খেলায় মজা পায় তার ভিতর গুঞ্জরিত তপোবন।

খাদে পড়ে গেলে অতসি আচ্ছাদনে মুড়িয়ে দেয়ার মানুষ আমি হয়তো পাবো!

হারানো বিজ্ঞপ্তি

যদি পেয়ে যাই খুনির মাতৃভাষা
পাথরে পাথরে বিরতি দিয়ে
ছুরি খুলে দাঁড়িয়ে আছো যে, তোমাকেও বলি—
নাব্যতা হারানো এক নদীর রগ চুষে
জাগ্রত আছে বিরতিহীন ভূমিশাবক

যদি পেয়ে যাই রোজা লুক্সেমবার্গের কবরের খোঁজ
ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটিও
গণিত শিখে আমপাতা জামপাতা গোণে
তাদের সংসার চলে যায় গাছ-কুড়ালের দোভাষী রূপে

যদি পেয়ে যাই স্মৃতির রক্তচোষা পয়গম্বর
অবিরাম নিয়তিবাদী অন্ধ কীর্তনগায়ক
যার কাঁধ ডুবে থাকে সুরের গোধুলিতে
চরণে প্রার্থনা দেবো, দেবো সবটুকু অধিরতা

যদি পেয়ে যাই অন্ধকারে সর্পচক্ষুর নীল আলো
ফিদেল ক্যাস্ত্রোর প্রধান জোব্বা কিংবা
তার ভিতরে মোড়ানো সমতাধর্মী ওম
আবার সাধারণ জলে ভিজবে দুটি প্রতারিত চোখ!

নির্জন স্কুল

নির্জন মুখ পার হয়ে যায় চঞ্চল ক্ষুর
ক্ষৌরকর্মার চিন্তাবীজ আহার করি
গন্ধ খাই তনুর
অনির্দিষ্ট স্মৃতি, অনির্দিষ্ট ঘুম
কার ঋতুর স্রাবে ভেসে যায় নির্বিকার
পুরুষের দুর্লভ প্রতিভা

মেঘের শিশ্ন দেখে সরস্বতীর কাম জেগে ওঠে
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। নির্জন কই!
আমাদের স্কুলে বিদ্যার বদলে বৃষ্টি বিতরিত হতো
আবার তোমাকে পাবো নির্জন স্কুল!
হরিদ্রা গ্রামের ভিতর খড়িমাটিশাদা
গোধুলি আসক্ত বালকের আঙুলসূত্রে
উতলা বসতবাড়ি, চোর, নারী, বাগডাশ

মূলত সবাই নির্জনে খোলে!

অভিমান

শেকলে বাঁধা হাত, এই হাত যমকেও দেবো না
ঘুণাক্ষরে জমেছে দুঃখাণু
একটি একটি বিদেহী পালক রেখে
হেঁটে গেছে পরমার কারসাজি
তাকে সতীনের বিছানায় ফেলতে পারি না।
যুগধন্য, কীর্তিমান মনোহারি যারা
আগলে রেখেছে স্মৃতিবিপণ্নতা
প্রখর নৈজস্ব্য বিলিয়ে দিয়ে তাদের
নামকরা স্বার্থান্ধে মুণ্ডু ঠেকিয়ে কোলাহল নেবো না
বিজন অধরে ইঙ্গিত কলাকামনা
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যৌবনবতী অন্ধকার
আমার চারমুখো রসের কাছে মোহাচ্ছন্ন দুপুরবেলা
আমি তাকে হরিতকী দেখাতে নিয়ে যাবো না

লক্ষ্য উদ্দেশ্য

তখন মান্দারে মান্দারে লাল খেলনাপাতি
চুকচুক করে খাই মিথ্যা-অন্ন
গুলতি ও চাড়ার দান এড়িয়ে
আসে গাওয়ালের হাঁক—
'চুড়ি আলতা নেবে, লাল টুকটুকে আলতা'

নাছিমা খালা, রাশিদা আপা ভরসাভরা নদী
জীবন থেকে জীবনে গ্যাছে যাদের কীর্তি
তাদের মুখে তাকিয়ে দেখেছি গাওয়ালের ছায়া।
কোনোদিনই বড়ো হতে চাইনি
চেয়েছিলাম ফাটা ফালগুনের মাঠ
এক ধরনের রমণীয় তন্দ্রাছাওয়া খেলনাপাতি

এক দম্পতিকে

পরস্পর শিকার নিয়ে ফিরছো ঘরে
স্মৃতিকর্তন শেষে মোহনায় ফেলে শৈশবের ঘোর
নৃত্যের তালে তালে ঘুরছে যৌথ পা;
উদ্দেশ্যের লেজ ধরতে ধরতে
বড়ো হয়ে গ্যাছে চোখের টিউমার

এই বর্ণাঢ্য ফেরার বেলা ঠিক ঠিক মনে পড়ে না সব
চোখের পাশে দৃশ্য রেখে যাওয়া যায় না বেশিদূর
যতদিন ছিলো হাতে হাতে আগুনের ফুল
ইচ্ছেমতো পুড়েছি সবাই
তারপর নেমে গেছি হাওয়ার খেতে

তবুও জোছনা ফুটেছে বনে
মুখের সনাক্তরেখা ধুয়ে গেছে সাবানে সাবানে

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে ইতিহাসের চোখ
বশে রেখো সঙ্গম কিংবা দাম্পত্যের ক্ষুর
স্মৃতির সামান্য দূরেই আছে চোখেরও কর্তন
স্বার্থান্ধ যতক্ষণ ততক্ষণই বিপ্লবের দোভাষী

তোমাদের হাতভরা শিকার আর প্রতিভার পুতুল!
তোমাদের জন্য রইলো বকুল

নারীবাদ

আমিতো কিছুই দেখছি না
কিছুটা আন্দাজ করতে পারি বলে দাঁড়িয়ে আছি
কোনো দৃশ্যের পেছনটা আমার জানা নেই
আপনি চাইলে এদিকে আরও একটু চেপে আসতে পারেন
এইতো এখানে, আমার নিকটটায়
যদি কিছু দেখতে পান আমাকে জানাবেন
সত্যিকারের কিছু হলেও এড়িয়ে যাবেন না

সামনের দিকটায় নিশ্চয় কিছু একটা গুপ্ত রয়েছে
জটলার মতো কি কিছু একটা আছে, সামনে?
তবে দূরবর্তী কণ্ঠ বাতাসে ভাসে
আমরা কিন্তু কিছুটা কাছাকাছি আসতে পারছি না
ঐ তো আপনি বলছিলেন নিকটে আসার কথা
আমি ভালো করেই শুনতে পাচ্ছি আপনার স্বরটা
একটা মস্তবড়ো শব্দ হলো
বাতাস থেকে কিছু একটা খসে পড়ছে
অন্তত চোখের সামনেই
কিন্তু দেখা যাচ্ছে না
আন্দাজ শুধু আন্দাজ করা যাচ্ছে
একটি মেয়েমানুষ বোধ হয় হারিয়ে কিছু খুঁজছে

পোশাকশ্রমিক চরণে

সেলাইল থেকে দুটি চোখ মাঠের দিকে যাত্রা করে
ধূলার থেকে উঠে সতত ইচ্ছার ডিম
এই নরোম রোদে তোমার অভিলাষ পুড়ছে না
বোনটির কথা ভেবে ভেবে
ভাইটির কথা ভেবে ভেবে
একদিন আগুনের নিয়মে হৃদযে রেখেছিলে পোড়ন
হে বোন, বিতাড়িত ছায়া হয়ে গেছো
পুকুরের নিমজ্জন হয়ে গেছো
কেনো ফুটে উঠছে না নিজ নিজ দেহের আযান
খাদ্যশূন্যতা, ঘুমশূন্যতা এই সোনার দেশে
তপ্ত ভাতের ভিতর, নিষ্পলক চোখের ভিতর
সারারাত একি ইশতেহার তুমি পড়ছো
স্থিরভাষ্য গণিকার পাহাড়ে বসে
কোনো আধুনিক গতিযান ছুঁতে পারে না
দেহের মর্মরিত অধিগমন কিংবা সদিচ্ছার শ্লোক
প্রাচীন দন্তীয় সভ্যতা দেহকোষে ছড়িয়েছে
নিদ্রানাশা আলোর কোলাহল
চোখে পলক পড়ার আগে লেজে কামড় দিয়ে
জাগাও রুধিরে ঘুমন্ত অজগর

স্বপ্নে বাড়িফেরা

বাড়ি যাবো, বাড়ি
সোনার বসন খুলতে খুলতে
শ্রাবণ মাসের শেষে
দুয়েকটি মেঘ অনাড়ম্বর, দুয়েকটি মেঘ রাধা

মায়ের জন্য পানের বিড়া
দিনদুনিয়ার তত্ত্ব তথ্য কালপুরুষের ব্যাখ্যা
অগ্রজ কোন্ আলো এসে ঘাড়ের উপর নাচে
সাদাবাড়ি, পূর্বপুরুষ, হীরকপতন দেখি
মাঠের মানুষ দুপুরজুড়ে শঙ্কা কিংবা সামন্ত গান গায়

বৃষ্টিবাতাস ছায়াসন্ধ্যা মুখের অশেষ রেখা
কে নিয়েছে শোকের আঁটি কে নিয়েছে মুকুর
বোনরে তোর হাতের তালু এতিমখানার পুকুর
ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠলাম বিস্মৃত সে রাতে
স্বপ্নে এমন বাড়িফেরা কান্না কান্না লাগে

হেমন্তের স্টেশনে

রূপালী বেদনা ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছো তুলা তুলা মেঘ
বিজনে পড়ে আছে তুমুল ঘোর, খসাপালকের ব্যাগ
স্বপ্নচ্যুত তন্দ্রা খুঁজে ফিরে অধরে অধর বাড়িয়ে
যে গেছে চলে কলমির মতো নুয়ে লকলকিয়ে

কোন্ ইঙ্গিত তুমি বহন করে চলছো স্বতন্ত্র পালকে
এখানে মুখ ঢেকে গেছে যবুথবু সতীর্থের আলোকে
নিরন্তর মাথা তোলে ধানবীজ ছড়িয়ে সুহৃদ রীতি
তবুও কি ছলিমের ঘরে পৌঁছোয় ফসলের প্রীতি!

দেহাতি যে নদী ছিলো কোনো এক কথকের কালে
যাযাবর জলসমাজ চোখ মুছে ফিরে গেছে
জ্ঞানকাণ্ডের আড়ালে
সময় তার সাধারণ বিমোহ ছড়িয়ে
স্বপ্নবাজ মমিনের হাতে দিয়ে চলে ঋণ
হেমন্তের স্টেশনে দাঁড়িয়ে বেঘোর কালো যুবতী শিরিন!

মুর্শিদের পথে

মুর্শিদের মোকাম থেকে ফিরে বাসেত আলী
গুনগুন করে ঈশ্বরের ভাবপ্রতিমা
গলায় আটকে থাকা সংসারলতা মোচড় দিয়ে ওঠে
স্ত্রী কন্যা পুত্রে ব্যাপ্ত প্রহেলিকা
একা মানুষের ঈশ্বরভাবনা অন্ধকারে উত্থিত
শিশ্নের মতো নির্ভার
জগতের স্ত্রীদাবি পুত্রদাবির ভিতর বাসেত আলী
নিজেকে গুঞ্জরিত করে আত্মমগ্ন হয় হীরক তরলে
মুর্শিদের কুহকী সত্তা তাকে দিকশূন্য করে।
পাখি ওড়ে, পালকে থাকে তার নির্যাস
মানুষের বিবরে ঈশ্বরের তালুক
দীর্ঘ অনিদ্রায় দুলছে
মানুষে মানুষ খোঁজার সংস্কার!

পৃথিবী

নাগরিকের হাতে কমলামতো অভিজ্ঞান
ব্যক্তির হাতে অন্তহীন খসখসে পিঠস্থান
এই বিরান ঐতিহ্যজুড়ে নেচে চলে
অপার বস্তুগত ঋতুকাল
পিতাকে দেখেছি এই নিয়ে ভেবেছেন বিস্তর
মাতাকে দেখেছি এড়িয়ে গেছেন চরাচর
আর আমাদের সময় ভরে গেছে ঝরাপাতায়!
গগনে উঠেছে তারা, যেমন সোনার পুত্র-কন্যা
জমিন ভরেছে শস্যে, যেমন মাটির উত্থান
তবু একদিনও বন্ধ হয়নি ভিক্ষুকের গান

অপেক্ষা

চৌচির মাঠে দেখতে পেলে একফোঁটা রক্তপাত
জানো না পাখির কিনা
খুঁজে খুঁজে কেটে গিয়ে ভোর কেটে গিয়ে রাত
আবার যখন রাত হয়, দেখতে পেলে নির্জনকে

গাছের ছায়ায় মাঠের পাশে অবাঙ দর্শক
স্মরণীয় রোদের দিনে দুটি চোখ ভরে গ্যাছে
পাখিদের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে
গান হয়েছে— রক্ত কার রক্ত কার বলে
তার ইতিহাস নিয়ে
বোবাস্বর ছড়িয়ে দিয়েছো মাঠের সবখানে
সমদর্শী এক পরিযায়ী- তাও কুড়িয়ে নিয়ে
গ্যাছে জনপদ পার হয়ে
তার ফিরে আসবার কথা
আমরা যেনো সেই অপেক্ষার পাখি!

উরোগামী পথ

নিজের মতো পথ ধরে গেলে কোনো জনসভায়, আলো রণ সন্ধ্যায় মধুমণ্ডিত প্রেরণা আর প্রখর খতিয়ান ভেদ করে, কারা এসে দাঁড়াবে সম্মুখে, জানো কি না! নিঃসঙ্গ পা, রক্তবর্ণ অধর তোমাকে যদি উৎস ছাড়া করে শোণিতে ছড়িয়ে দেয় হাজার প্রকার উঁই! হে পরিব্রাজক তাই। তাই তোমাকে বলছি নিথর সমতটে দাঁড়িয়ে

যখন আমার স্বপ্নবোধ; একদল পুত্রখাদক কনফারেন্স করছে! এই অবারিত আলোয় অযথার্থ উপায় আর উদ্ধার দূরাসন্ন- আমার এই উরোগামী পথ দিয়ে যাবো তৃণকে ডেকে। সকল গর্ভপাতের ইন্ট্রো দিতে হবে আমাকেই শিশ্নের ত্বক কেটে কেটে!

নো-ম্যানসল্যান্ড

জীবনের ছাপচিত্র গরিব আলোর মতো জ্বলছে
গারোপাহাড়ের পরে
হৃদয়ের দুই রকম উপাখ্যান দুই ব্যর্থবিধান
সীমান্ত পার হয়ে আসে একপ্রকার বিশ্বাস—
দুইপাড়েই আমাদের সন্ত্রস্ত ঘুমের অধিকার!
তোমার মুখ মনে করতে যেটুকু স্মৃতি দরকার
তার অর্ধেকটাও সীমান্তোপারে জড়িত

আমাদের কোনো বিস্মৃতিই সার্বভৌম নয়!

প্রার্থনা এই

মা, আগুনে নির্লিপ্ত মূর্ছনা!
চালের উপর দিয়ে যে শাদাবক উড়ে গেছে দক্ষিণের চকে
জানি না সে ফিরেছে কিনা পুরনো পথে
ভরা বর্ষার রাতে হাওয়া পল্টিখাওয়া মাঠে ঝরেছে তোমার নূর
পাষণ্ডের ফুঁয়ে উড়ে গেছে হয়তো দূরবলয়ে
তবু তুমি আমার গালে কেনো রেখেছিলে আখ্যানের বীজ!
রক্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গড়ে তুলেছিলে যে ভ্রূণ
তার বিপণ্ন উত্থান তোমাকে করেছে ঘোরলাগা মানুষ
কিছুটা নিজের বাকিটা ঈশ্বরের উত্তেজনায়
দুর্লভ দাম্পত্য তুমি করেছো ভুবনের পাড়ে
বন্যতিমিরে অসীম আত্মা ভাসতে দেখে
যাদের ঘুম ভাঙতো, তারাও নেই
কাকে তোমার তাৎপর্যমাখা সম্প্রসারণ দেখাই!
যতো পাতা ঝরে আর মরে, আমি শুনি এক বনরোদন
কিছুই বদলায় না তাতে; শুধু তোমার গ্রামখানা এক জটিল
হিসাবের তোড়ে আসা-যাওয়া করে— আমি সব দেখি
বাতাসের নম্রতা নিয়ে চারপাশ ঘুরি, হারাই আর পেয়ে যাই
ঘাড়ের উপর জ্বলতে থাকে এক উজ্জ্বল অনুতাপ

আলোর মফঃস্বল

আলোর মফঃস্বলে থাকি আমি আর জোনাকি
পাতাবাহারের রঙ দেখি, ঘুমের ভিতর ঘুরি
পাতাগুলো ঝরে যায়, আসে বসন্ত
বিরামহীন ভাঙনের স্মৃতি নিয়ে
সতর্ক হাঁটেন এনজিও আপা মল্লিকা দে
আলোর জখম বুকে এখানে গানওয়ালাও থাকে
প্রধান শহরের দূরে একটি আলোর মফঃস্বল
শাদাকালো স্মৃতির খোঁজে বড়ো হয় অন্ধভ্রূণ
এখানে ঈশ্বর বলতে- নিঃসঙ্গতা
কবি আবাদ করেন অশ্রুপাত আর উরোগামী পথ
সাধারণত এখানে বংশীবাদক বেশি
যেকোনো অতিথির জন্য একটি সুরের গোধুলি
স্বাগতম হে অবশিষ্ট ভুবন— এখানে প্রকৃত ক্রন্দন

একজন জুনাবালি

ঘোর কেটে গেলে আমি হবো জুনাবালির নির্লিপ্ত চোখ
আসতে যেতে তোমাদের ছায়াতাড়ানিয়া রৌদ্রে উড়িয়ে
দেবো ইচ্ছামৃত্যুর ধুল।
মানুষ থেকে আরেক মানুষে উদ্যত নিঃসঙ্গতা,
কুশলকাব্য, পাখিশিকার সব অর্থপূর্ণ আয়োজন
পার হয়ে গিয়েছিলেন জুনাবালি।
আমি সেই দূরতম মানুষটির কথা বলছি—
যার হৃদয় আলোর খাদ্য আর অবিস্মরণীয় সংশয়!
ঘোর কেটে গেলে আমি হয়তো মধ্যপন্থি ছায়াদর্শী হবো
কিন্তু প্রখর নির্লিপ্ততা আর জুনাবালির দীর্ঘাবয়ব
আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না
তবুও আমি হয়তো জুনাবালির তামাটে হৃদয় হবো না
মাঠের প্রান্তছুঁয়ে যাওয়া রৌদ্রে যে রঙবিবর দেখেছি—
সেখানে স্বপ্নচ্যুত কৃষিকাব্য হাতে উড়ছে জুনাবালি
আমি তার প্রখর উদ্দেশ্য স্বপ্নমণ্ডলে ধরে রাখি

বিজ্ঞপ্তি

খসে পড়ছে মনঃস্তাপ
দুরন্ত ঘাড়ের উপরে
উড়ছে ঘুণের গুঁড়া
হয়ে যাচ্ছো প্রদোষ
ঘুমের মতো প্রসন্ন
ফু দিয়ে মিলিয়ে যাও
প্রাণকোষ অধির করে
তুমি আসো তালুবন্দি
অন্ধকার মহোদয়
যেনো পার হওয়া ছেলেবেলা
যাদুকর, ভূমির বাকলে
শহরজুড়ে আমি খুঁজি
লৌহময়, স্তিমিত পরশ্রী
আলোর মতো

বসন্ত দাসের মরামেয়ে গ্রামে আসে পূর্ণিমা হয়ে

পিপাসিত মুখখানা চোখে পড়ে
জানা গেলো এই ঘরেই থাকেন বসন্ত দাস
যার মরামেয়ে চিতার আগুন থেকে উড়ে গিয়ে
গ্রামে ফিরে ফিরে আসে পূর্ণিমা হয়ে
আগ্নেয় মানবীর এই আগমন
পূজনীয় মাত্রায় উন্নীত জনপদে
সেই থেকে বসন্ত দাস কন্যাবিয়োগ
সামলে নিয়ে এক গর্বিত প্রণোদনা।

বালিকা ফিরে আসে পূর্ণিমার রাতে
বালিকা ফিরে যায় পূর্ণিমার রাতে
স্বাগতিক এই গ্রাম পূর্ণচাঁদের ছোঁয়ায় আলোকিত
হারাতে চায় না তার কোনোই গৌরব
মানুষ থেকে মানুষে কাঠি বহন করে চলে
আর অতিকল্পনার ঘোর মাখায় একা মানুষের মুখে
জটিল খনন শেষে এই লোকালয় ঘুমের নিমজ্জন
চারপাশে প্রহরারত ঐতিহাসিক অনির্বচন
ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে ভাব ও বৈদগ্ধতায়
যার মূলে গ্রামখানা শতবর্ষী নিঃসঙ্গতা নিয়ে
উজানমুখি এক ভাবের নৌকা
যেমন বসন্ত দাস কন্যাস্মৃতিতে এক অবিরল মানুষ
ঘুমে ও জেগে থাকায় সমান দৃষ্টিক্ষম
পূর্ণ মৌনতায় ভাবচক্রে নির্লিপ্ত এক বঙ্গমাঠ

ভাঙচুর

পাখি নাই পাখি নাই বেদনা ঘিরে
অনন্ত সময়রেখা ঘুরছে আপন বেগে
ইচ্ছে শুধু বালুচাপা মরাপাতা নিঃসঙ্গ দুপুরে
ঝরছে বালকবেলা, কোথায় আড়বাঁশির মুখ
সত্য এক মনোহর ধারণা- রূপান্তর আছে, সততা নাই
বহুকোণ চেতনায় ঘুমের দণ্ড গড়ায়
জেগে থাকে বাধ্যগত মৃত্যুর কলস
মানুষের মতো এখানে সন্ধ্যার আড়ষ্টতা
মানুষের মতো এখানে শুধু আয়ুর বোতল
তুমি নেই কোথাও পাওয়া গেলো না প্রতিস্বর
তোমার নামের পাশে আমাকে
আমার নামের পাশে তোমাকে ভাঙচুর।
চিরকাল অন্ধজনের হাতে মুদ্রা দিয়ে গেছি
তার চোখে আলোর বিকাশ হয় না বলেই কি
আমি চোখে দেখি!

লাইবুড়ানী

হাঁটতে হাঁটতে সোনাবান্ধব বন
বড়বেলার রক্ত হয় ছেলেবেলার বর্ষা
মেঘের ছুরিতে কাটে বুকের স্ফুলিং
যন্ত্রজালিক চোখের ঘোরে অশরীরী
ঘুমের ডিম; হাওয়ার পুলক পেয়ে
পাতায় পাতায় ঘুরে বৃষ্টিবিরহে
তার নাম পরিযায়ী ভাসান
ভাসানও আছে, তুমিও আছো
চঞ্চল মাছের কানকোয় ভরা আগুন

সোনাবান্ধব বন ঝরে বর্ষার রেণু হয়ে
মেঘ ডাকে আর ভাঙে কৈমাছের ঝাঁক
আমরা ভাঙি ঝাঁকের ভিতরে একা
লাইবুড়ানী খেলায় জলমগ্ন বালক
ফেলে এসেছি প্রতি বর্ষায় একটি পালক

সম্পর্কশাস্ত্র ০৫

তোমাদের হেঁটেযাওয়া পথে
বেদনার দানা ছিটিয়ে পাখি ধরি
কেউই আমাকে পাখিওয়ালা বলে না
আমিও পাখিদের গণিত বুঝি না
যেটুকু ইঙ্গিত পাই
হাওয়ায় ছড়িয়ে দেই
আবার নতুন করে বেদনার পাশে বসি
তোমাদের মুখগুলো এককেটি স্মৃতির দুপুর
তোমরা আমার ঘর গুছিয়ে বাহির করেছো সুদূর
আমি ঝরাপাতা হলে ঋতুর অপেক্ষায় থাকতাম
মেঘখণ্ড হলে পাহাড় এড়াতে চাইতাম
আর পাখিওয়ালা হলে
ভাই বোন প্রেমিকা বন্ধুকে প্রার্থনায় বলতাম
তোমাদের মঙ্গল গাইয়ে হবো না আমি
হবো পেছনপথের ধুলকুড়িয়ে
যে ধুল চোখে মেখে অন্ধ হওয়া যায় অকাতরে

হাওয়ার মুদ্রা

দুয়ার খুলে যায় হাওয়ার মুদ্রায়
স্মৃতির জোল দিয়ে নামে বালিকাকুসুম
তার দোভাষী রূপে উঠান ভ'রে
বসন্তের ঘূর্ণিহাওয়া—
মানুষ কি জানে
দূরে ও কাছে রয়েছে গর্বিত প্রত্যাখ্যান!
তবুও কেউ এসে রেখে যায় সরস তাম্বুল
কারো অপেক্ষার মৌনতায় ভরে দরদালান।
মাটির চিড়ের ভিতর শস্যের গুনগুন
শুনতে শুনতে মাঠের কৃষক
অপার আত্মায় জাগায় ফসলি পক্ষী
তারও একটা গর্বিত প্রত্যাখ্যান
জীবনব্যাপে বিস্ময়ী ঘোরে চক্কর দ্যায়
মাঠের ঘূর্ণিহাওয়া কিংবা ভাবনিমজ্জন।
তখন মাঠের চিড়ে চিড়ে তিমির-ক্রন্দন
প্রহরে জারি করে কাম, ধূলা, মাৎস্যান্যায়

এবারও ঝারাপাতায় লেগে থাকবে
নতুন কোনো সম্পর্কবিরতি!

মরিয়মনামা

০১.
সবকিছু ভেঙে গেলে গড়ে ওঠে কীটদষ্ট একক
একই সঙ্গে বাড়ে মৌমাছির রক্ত আর মধুসঞ্চয়
তারপর ভরা আর শূন্যতার খেলা
গহিন আঁধারের বুদ্বুদ থেকে আলোর রণে
ফুটেছে যত দূর অতিক্রমের বিজ্ঞান
তার নিকটেই মরিয়ম শুনেছে ভাঙনের গুনগুন

হারিয়ে গেছে মরিয়ম পালকে ঘটিয়ে রক্তিম উন্নয়ন
তার ডানার বাতাস অন্তরীক্ষে বাজায় স্মৃতির হাড়কণা
সমর্পণের ভোরে সে প্রাণ রেখেছিলো প্রাণে
জীবনশাস্ত্র করেছিলো পাঠ শ্রেণীর প্রকরণে
সে মধুর বাসনা জনপদে ছড়িয়ে গেছে বুনো ঘোর
মৌন মানুষের অন্তঃস্থ আহরণ পুড়তে পুড়তে
ফেরারি করে গেছে সভ্যতা।
মরিয়ম তার সোনালী ঘোরে বেঁধে স্মৃতির কঙ্কাল
বৈসাদৃশ্যের নগরে করেছে পাষণ্ড সত্যের চাষ।

০২.
উড়ে এসে ডালে বসে পাখি
সিক্ত নয়নে আকাশ দ্যাখায় রোদনের কালাপানি
যে মায়াবী হেঁটেছে এই গোপ্টাপথে
তার আশীষ আছে শূন্যতা জাপ্টে ধরে!
ও মেঘ বিরহী, জানাও তোমার স্মৃতির ভূমি
সে কোন্ ঘরের দুয়ার করেছে বন্ধ আমি কি জানি?
বহুপথ ঘুরে এসে এখানে শান্তি আছে, যদি সে জানে
কী করে তৈরি হয় শূন্যতা!
বিদায়ের কালে ফাটাপ্রদীপের আলো নাচে ঘরে
চকের বাতাস এসে দুয়ারে লাগে
ডালে বসা কোন্ পাখি পালকে ভর দিয়ে শূন্যতা ধরে!
মরিয়ম খালি ঘুরে কষ্টের জাদুঘরে

০৩
হাঁসগুলো জানে পাড়ি না দিলে পালকে কত রক্ত জমে
যৌথ ইতিহাস বুননের দায় জাপ্টে ধরে ব্যক্তিগত ঘাড়
তবুও মাঠে চাষবাসের মতোই তোমার অহংকার ছড়ায় আশা
মনজুড়ে বিরহ-গৌরব গড়ে তোলে সোনালী কুহক
করমর্দন শেষে মুঠো ছেড়ে দিলে, মাটিতে পড়ে সম্পর্কের খোল
কেউ তার অল্প জানে, কেউ না জেনেও মেনে নিয়েছে এই রীতি
তোমাকে আর রক্তে মেশানো যায় না মরিয়ম
সন্তান অবধি ছড়িয়ে গেছো অভিলাষের ঘুণ
কারো কারো ঘরে ফেরা হয় না বলেই তৈরি হয় বাকি ইতিহাস
একদিন তোমাকেও মাতিয়ে যাবে নিঃসঙ্গ তুফান

০৪.
মনুয়াপাখি ঘিরে যে আগুনের বিস্তার
পাড়াজুড়ে ছড়িয়ে গেছে তার আগ্নেয় গান
হৃদয় থেকে দূরে আমাদের বুদ্ধির বিজ্ঞান
তারে করেছে সংশয় হারা রোদনের নালা
বাড়ন্ত শস্যের উপর দিয়ে বয়ে চলা হাওয়া
নিরন্ন কৌশল মাখে মুখের আদলে
দেহ থেকে ঝড়েপড়া অধিরতা
তৈরি করে নির্জন ছায়া
একদিন হাত দেখার ছলে এড়িয়ে গেছি করমর্দন
একদিন জ্ঞানতত্ত্বের ঘোরে ভেঙেছি শস্যের ডগা
মরিয়ম জানতো না ভাঙনের অধিক কলা!

০৫.
দেহ থেকে তন্দ্রা নেমে এসে মিলায় দেহে
ফুলে ফুলে ওঠে মাংশের গান
তাকেই স্মরণ করে চলে উজ্জ্বল হাহাকার
আমাদের নিয়ে বিস্তর চাষ হলো আগুনের
আগ্নেয় রীতির এক জীবননালা ঘুরছে অবিরল;
নম্রপথ শুনিয়েছে তার ধুলোসঙ্গীত।
যাদুর বাগানে ছিলে, যাদুর বাগানে গ্যাছো
সে ঘোর লক্ষ্য করে চলে স্বপ্নশুনানি
মরিয়ম যদি থাকো ঘুমে আর মরিয়ম যদি থাকো জেগে
ধরে রাখো অবাঙ উৎস ফুঁড়ে উঠা মৌন ক্ষরণ
আর চোখজুড়ে অতসী ঘুম
মানুষ শুধু স্মৃতির বাঁশি, ছিদ্রে ছিদ্রে রোদনের নতুন আরশ
একটি করে আঙুল টেপায় যুক্ত হয় ধীরগতির মরণপণ!

০৬
অধর ছুঁয়ে গ্যাছে পরীর বিষ
শীতল বিছানায় রাতের সেলাই মাখামাখি মরিয়ম
মাঠ আর ফসলের আশা শুনিয়ে
ফলেছে দুঃখের ধান।
মায়াচূর্ণ মানুষের বিজন হৃদয়
পড়ে আছে ঘন কামিনীর বনে
জীবন আর জীবনের পুষ্পতলা
উভয় মিলে এই পথে যাচ্ছিলো
ভোরের গাঢ় সূর্য একপাশে
আরেক পাশে নিজের ছায়া
তুমি সেই মাঠে রৌদ্র-ছায়ার ইতিউতি
একজন হারানো মানুষ, অন্যজন আন্ধারের পুতুল!

০৭.
রক্ত, রূহ, ত্বক থেকে ফলিত মরিয়ম
ঘুমের দেশে নিমশাদা নর্তকী হয়ে আছে
জগতে সকল মোহনীয় রূপের ভিতর
আগ্নেয় সভ্যতার বুদ্বুদ হয়ে কি পাওয়া যাবে
যদি মানুষই না শুনলো তার অরূপের গান!
সঙ্গীতের যাদুময়ী ঘোরে তার চলাচল যেনো
বাতাসে ভেসে বেড়ানো সুবাস।
মৃত্যুর মধ্যস্থতায় দুই রকম বাস্তবতা
আমূল ঘ্রাণের ভিতর উত্তেজিত করে
আমরা পুলকিত দূর তারাদের আলোয়
লটকনের ডাল থেকে ঝাঁপ দেয় মরিয়ম
আলোচঞ্চল ভ্রমে

০৮.
হৃদয়ের ঘূর্ণিপাকে অসীম শূন্যতায় জড়িয়ে ঘুম
দমে দমে মরিয়ম নাচে রক্তের মাহফিলে
প্রমত্তা অতীত শান্তি, সঙ্গম, নিদ্রাবিধি পার হয়ে
আপন আলোকের ভিতর শায়িত দুর্গম অনিশ্চয়তা
একটু একটু করে সঙ্গীত হয়ে ওঠা রক্তগতি
রুখে দাঁড়ায় সীমাহীন মৌনতা
আর ডানা বাড়িয়ে তুমি ধরছো মরাঈশ্বর
একটি হৃদয় থেকে একটি বিহ্বলতা দূরে থাকে
তুমি থাকো বহুমুখী রেখার মতো গন্তব্যবিমুখ

০৯.
অনন্ত প্রহরে প্রহরে স্বপ্নজারি করে
সামন্ত শহরে খুঁজছো ঘরছুট অবাঙযাত্রা।
কবরের সন্ন্যাস ফুঁড়ে আসে মৃতের স্তুতি
বাতাসে বাতাসে উপেক্ষিত মৃতমানুষের গুঞ্জন
মাঠের তির তির হাওয়ায় ওড়ে
সোনায় রূপায় মোড়ানো সেই ব্যর্থমিলন।
ডানায় ক্লান্তির প্রসারমাখা জাগৃতি
তার ভিতর ওড়ে মধ্যবিত্ত উন্নয়ন—
চাকা ঘুরায় সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার ফাঁকে ফাঁকে
ঘুম, উত্তেজনা অপার উত্তর-দক্ষিণ শেষে
মরিয়ম দিশাহীন চোখের ভিতর মরাগোধুলি মাখে

১০.
পড়তি রোদের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখা
সারাদিন রক্তে মিশ্রিত আশার ঝুল
গ্রামের মহিমা ঘিরে জ্যোৎস্নায় নামে সগীর শাহ
শত বিপদে পথ দেখায় মাটির বান্দাকে!
তার আশীষ নিয়ে মাঠে হাওয়া ঘুরে।
এ সুবাসিত গ্রাম শুধু ধরে রাখে আবেগ-আর্দ্র স্মৃতিবদল
একা এক মানুষ আর ভালোবাসার ধুলিঝড়ে
পাকখাওয়া মরিয়ম অপরাহ্নদৃশ্যের ভেতর
উঁকি দিয়ে আছে যেনো হারোনো সড়ক

১১.
উত্তর দক্ষিণে ঝুঁকে মৃত মরিয়ম খুঁজতো সুপুরুষ বাহু
শীতল আত্মায় জমে থাকা বরফের থোক লোকালয়ে
আলোর রূপকথা ছড়িয়ে দ্যায় মানুষের বিবরে
ভরা জ্যোৎস্নারাতে দক্ষিণচকে দেখা দেয় আগুনের অজগর
আস্তে আস্তে গ্রামটা মুখে তুলে নেয় আগ্নেয় জিকিরে তুলে।
আরেকপাশে মরিয়ম ব্যান্ডেজ দেখায় ঘুমগ্রস্ত ব্যক্তিকে
হারায় না কিছুই, হারানোর নাই কোনো আদর্শ প্ররোচনা
প্রতিভার হননকারী বেগ শুধু ঘুরে মৌনমানুষের একক বিষে

১২.
জবাই হওয়ার রক্ত থেকে গেছে আর ধুয়ে গেছে শাদা বৃষ্টিপাত
পায়চারী, কোলাহল, খুনের সম্মেলক প্রতিভা সবকিছুই পূর্বাচার
মধুমুখী কথকের গুনগুনে যে সম্মোহন ছিলো, সে এক নির্লিপ্ত মগ্নতা
এর বেশি ইতিহাসে নেই, ইতিহাসে থাকে না ব্যক্তির গহিন মগ্নতা
তবুও জবাইদৃশ্য দেখে দেখে একদিন স্তব্ধ হলো প্রেরণার শূঁড়
নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি শুনে আরো দুরূহ হলো হারানো মানুষ
সমকাল পাবে কি তারে ধূলায় তরল, দাহ্য কিংবা অশ্রুপাতে!
হন্যে হয়ে মেঘগুলি পূর্ণদ্বিধার অযুত বলয় ঘুরতে থাকে
শূন্যবিবরে ডুব দিয়ে মরিয়ম জঠরব্যথা ভোলে

১৩.
ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরিয়ম একলা হয়ে যায়।
রাতের হাওয়ায় গুনগুন করে বর্ণিল ভাববাজার
কেউ অন্ধকারে কেউ নির্জন মাঠের আলে
দেহের মনোহর প্রতারণায় একলা মানুষ বিলুপ্ত ঊষা;
বন্ধকী রীতির বিপরীত দ্বিচারিতায়
দেহ থেকে দেহে প্রস্তাবিত নহর-প্রতারণা
তার পাশে মানুষ অনুরণিত তিমিরের উদ্দীপনা
ঘোরসংশয়ে হারিয়ে ফ্যালে ত্রিকালদর্শী নয়নখানা
এভাবেই শুরু ইচ্ছামৃত্যুর স্বাধীন সম্ভাবনা
তখনো মরিয়ম ঘুমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুপ্ত পয়গাম্বর
সত্তার নিগূঢ় উন্মোচনে উড়ায় জটিল ডানার পাখি

১৪.
জগতের ভাবডালে বিমূর্ত ফলের মতো দৃশ্যত
অন্ধের থালায় পড়া চমকপ্রদ আধুলির
রূপাবিদ্যুৎ ছড়ায় তোমার মুখ
জলার রৌদ্র-ছায়া মনোহর ঘূর্ণিহাওয়ায়
উড়ছে যত জলকণা
তার পাশেই নামছো সাধারণ রক্তিমাশা!
সৌরবর্ষের একপাশে স্মৃতির দেউল আরেক পাশে
ঘুমন্ত নারীমুখ; নিয়ে গেছে নির্জন দুপুরে
তখনও মরিয়ম চোখের গহিনে পূর্ণ আস্থার ডোবা
দুই হাত তুলে লুফে নিতে থাকি ঈশ্বরের নারীভাবনা

১৫.
গোধুলি নির্ণয়ী আলো দিগন্তে মাখায় মেলাফেরত বাঁশি
একলা মানুষ ব্যক্তিগত কুহকে বসে ভাঙে তার শিথিল ডিম
দূরপথ হেঁটে এসে যার যার স্মৃতির ঘুণ
তন্ত্র মন্ত্রের ইঙ্গিতে ভিতরে ফুটায় অন্ধবীজ
এভাবেই আমাদের প্রিয়-অপ্রিয় মুহূর্তের
বিরল কৌশলে লিপ্ত ঈশ্বরের মরমী নিয়ন্ত্রণ।
অন্যের নিকটরেখা পার হওয়া
যায় না বলেই দূরত্ব এতো প্রার্থনীয়!
তবুও মরিয়ম গোধুলির নির্ণয়ী আলোয় আকীর্ণ গোলক
পরম সূত্রে গাঁথা তার দূরে যাওয়ার চঞ্চলতা।
সোনালী ধানের দেশে মানুষের একটিই মরিয়ম থাকে

১৬.
হারানো সংশয়ের মাতৃভাষা মরিয়ম।
জোনাকি ঘুরঘুর রাতে
পটভূমির বটে বসা বিরল পাখিসভা
আছে তার ব্যক্তিগত গুনগুনে।
বিলোপ ঘটে গ্যাছে রসিক চুম্বনের
দুই ফালি ঠোঁট শুধু দুইথোক তামাশা
সম্ভাষণের আক্ষেপে জ্বলেওঠা চোরাকম্পন
পাথরের পরতে ঘুমিয়ে গ্যাছে।
তখনো মরিয়ম বেঁচেছিলো গরম রুধিরে

১৭.
রাধানাথ ঘোষ, তুমি বুঝতে না ভবের খেলা
কানের পাশদিয়ে গুলি গেলে, ঠিকই বেঁচেছিলে
মাঠে মরেছে তোমার নারীভাবনা
তাইতো সকলে বলে— বোকা কিংবা বুদ্ধিমান
কোনোটাই ছিলো না রাধানাথ ঘোষ
গণিতকার্যে ইতিহাসখ্যাত যারা
তাদের পাশে তুমি অনর্থক মহড়া
তোমার চোখের চঞ্চল আলো
পৌছতে পারেনি সেসব সোনালী মহলে।
অন্ধকারে মুক্তকরা ডানা— শূন্যে পাক খেয়ে
হাতে আসে যখন
তখন মরিয়ম আসে বাতাসে বাতাসে আতর হয়ে
আর আলোময়, স্বপ্নভূক আকাংক্ষা ধরে
বাজাতে থাকো হাঁড়ের পোড়ন